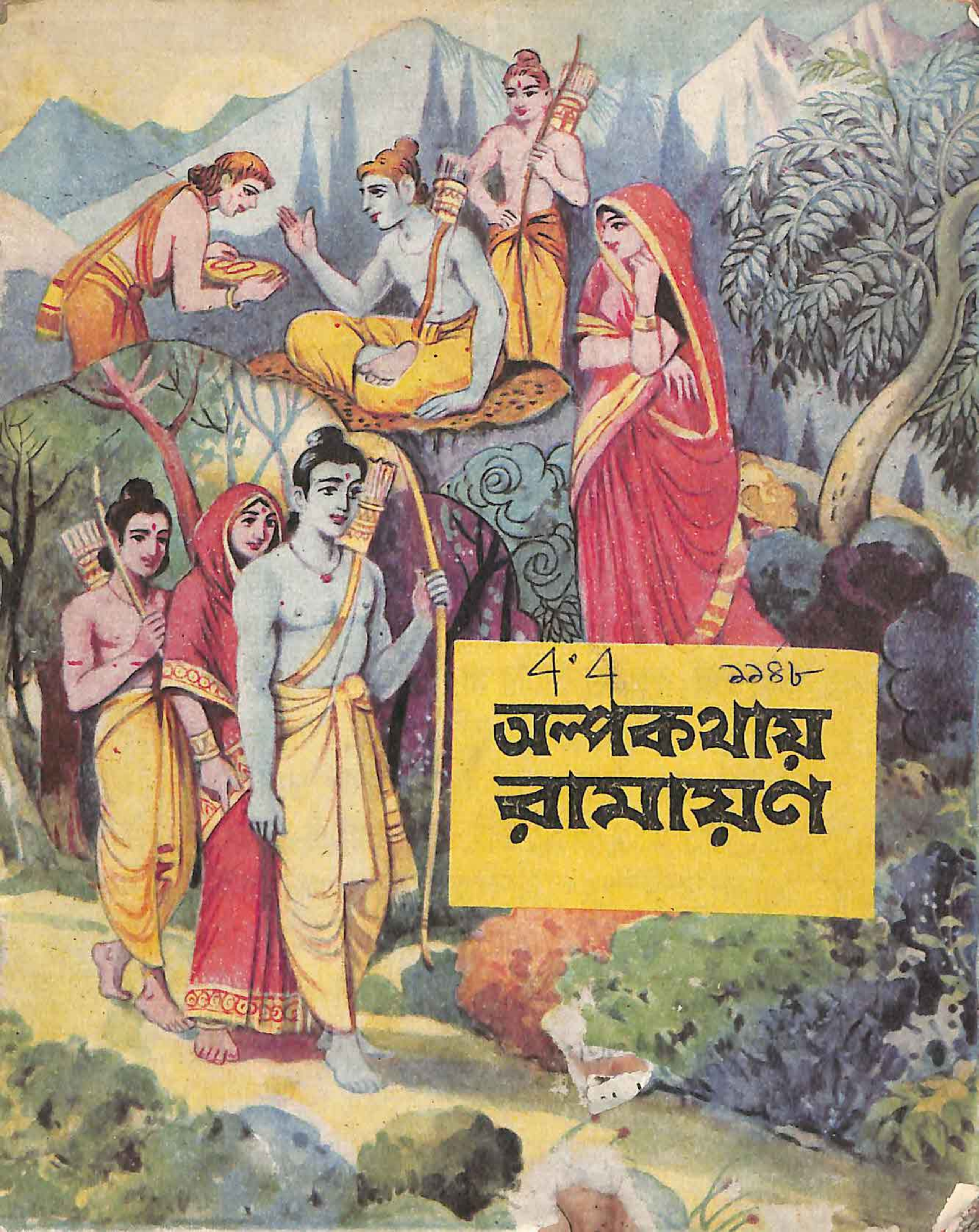
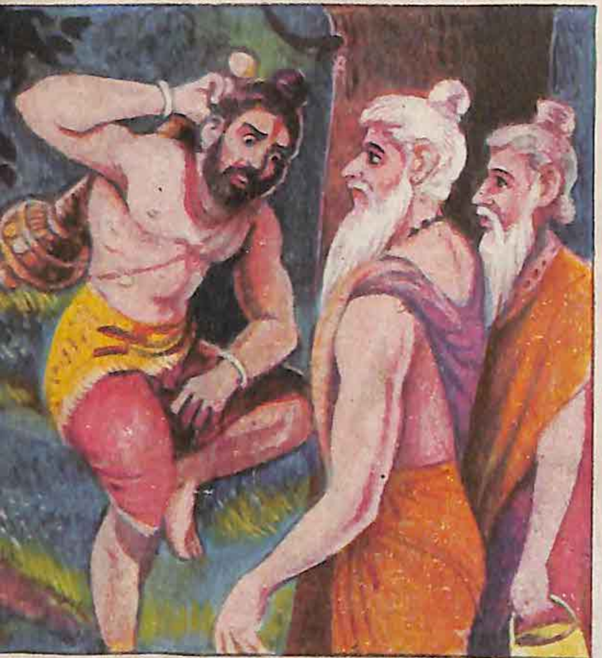
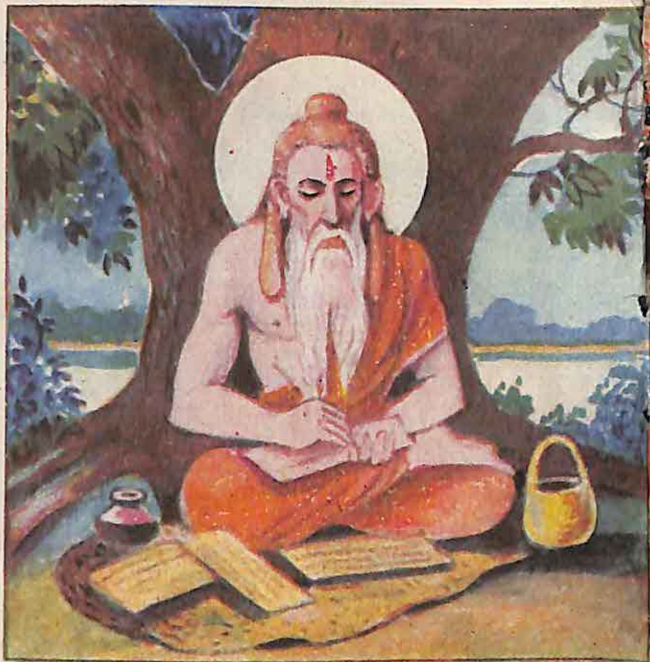


অল্পকথায় রামায়ণ

অনেক কাল আগে_এক বনে রত্নাকর নামে এক দস্যু ছিল, বনপথে কাউকে দেখলেই সে তাকে খুন করে সব কেড়ে নিত। একদিন নারদ ও ব্রহ্মা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রত্নাকর তাঁদের মারতে গেল, ব্রহ্মা বললেন_

"নিত্য নিত্য পাপ তুমি কর কার লাগি',
তোমার এ পাতকের কেহ আছে ভাগী ?"

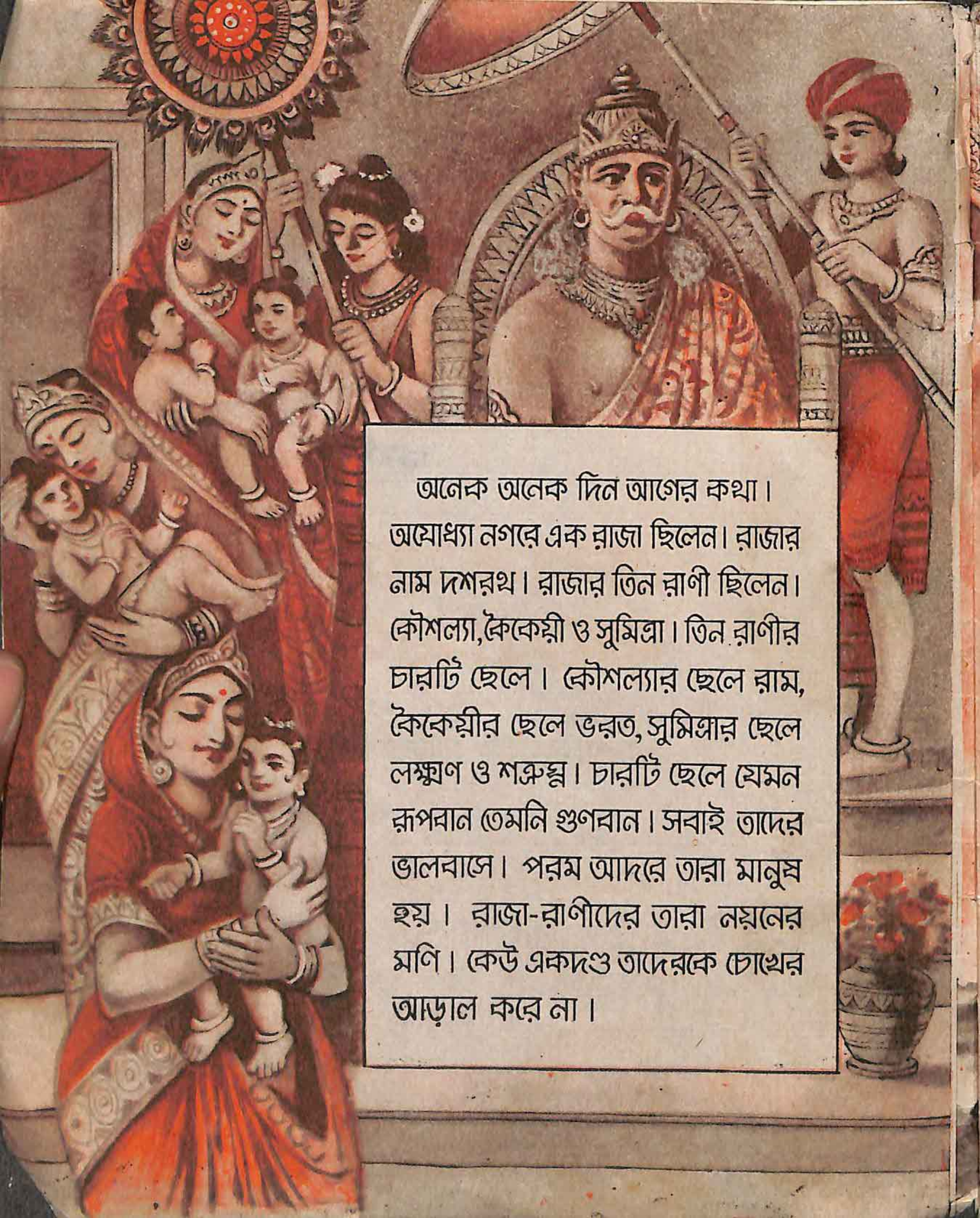
দস্যু বলল_'পিতা, মাতা, স্ত্রী সকলেই, কারণ আমিই তাদের খাওয়াই পরাই'। নারদ বললেন_'বাড়ী গিয়ে তাদেরে জিজ্ঞেস করে এস।' বাড়ী গিয়ে রত্নাকর সকলকে জিজ্ঞেস করল, কিন্তু পাপের ভাগ কেউ নিতে চাইল না। রত্নাকর ফিরে এল। নারদ বললেন_'রাম নাম কর, সব পাপ থেকে মুক্ত হবে।' অনেক কাল এক ভাবে বসে রাম নাম করতে করতে তিনি বল্মীক স্তূপ বা উই ঢিবির মধ্যে ঢাকা পড়ে গেলেন, তাই তাঁর নাম হল বাল্মীকি। ব্রহ্মার বরে ঋষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করে জগতে অমর হয়ে রইলেন।



অল্পকথায় রামায়ণ

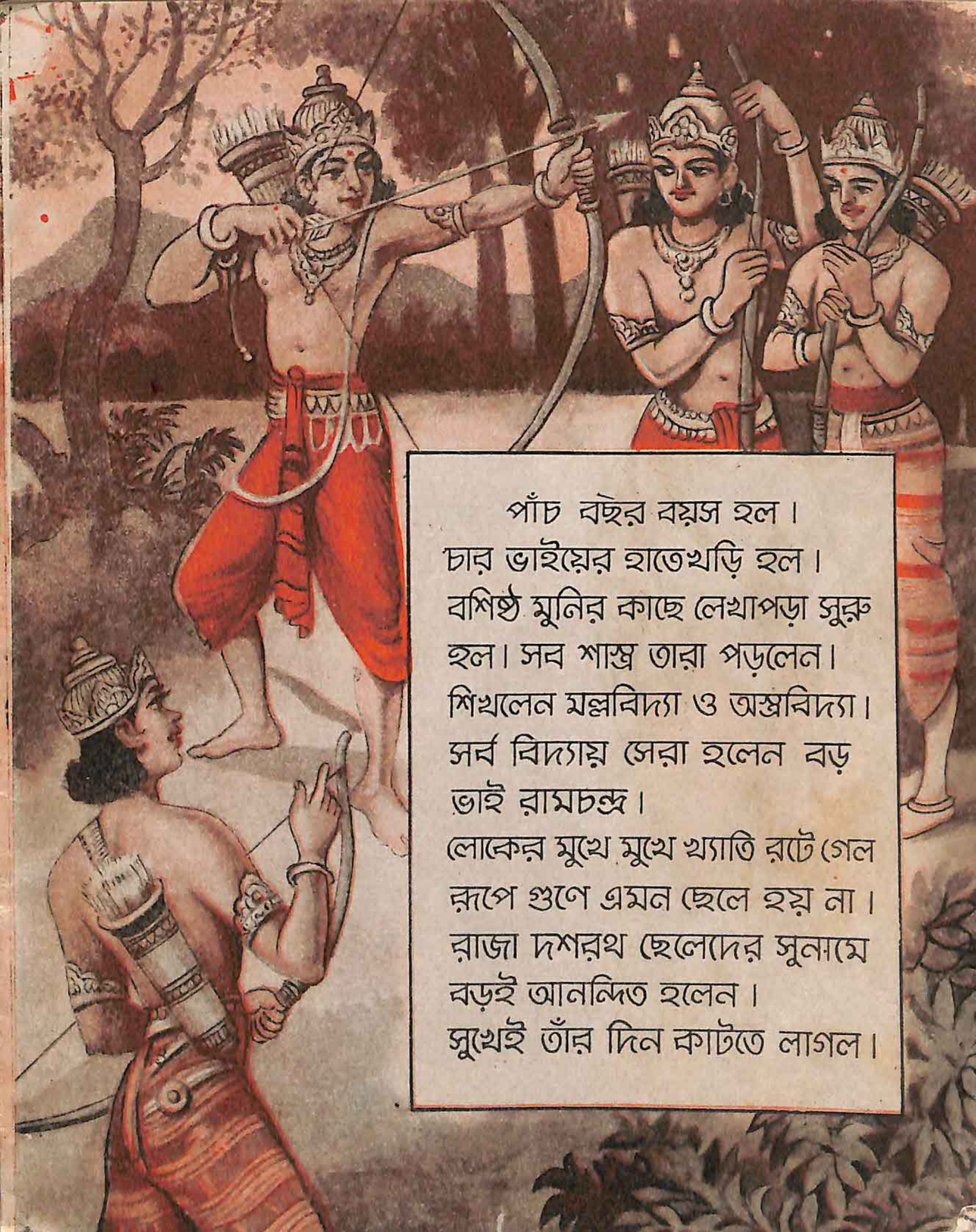
প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
কলিকাতা-৭
দাম : ৪·০০ মাত্র

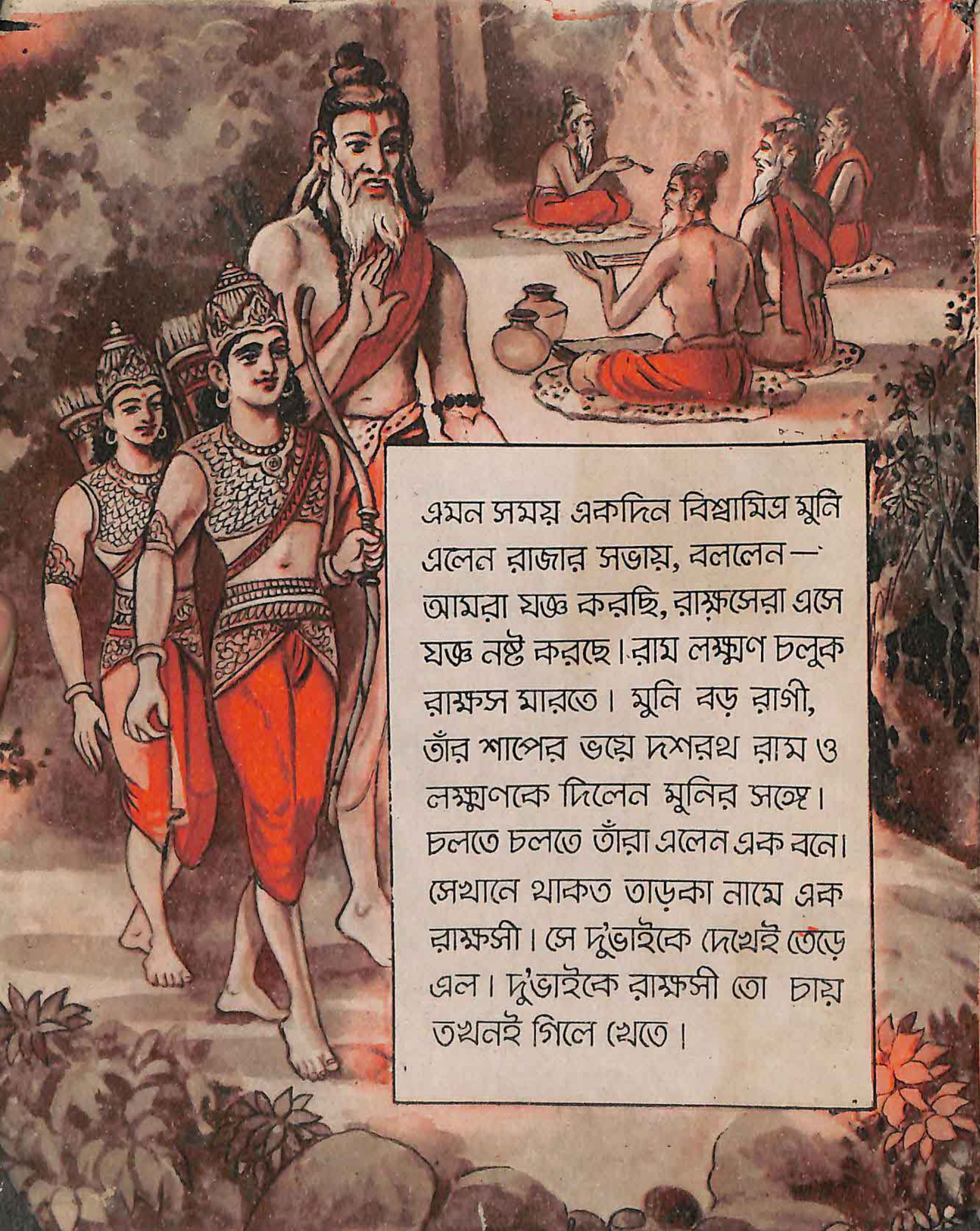


অনেক অনেক দিন আগের কথা।

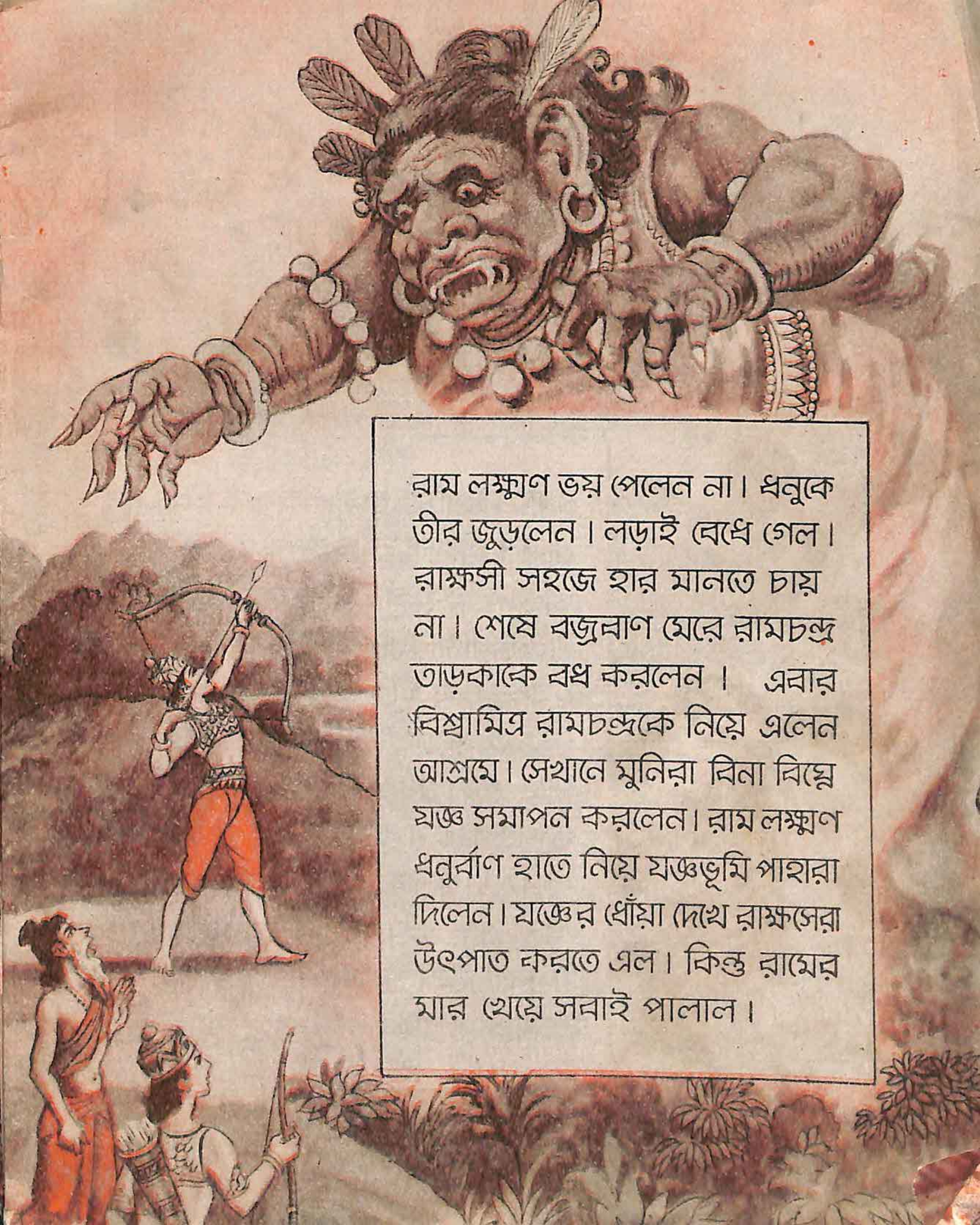
অযোধ্যা নগরে এক রাজা ছিলেন। রাজার নাম দশরথ। রাজার তিন রাণী ছিলেন। কৌশল্যা,কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। তিন রাণীর চারটি ছেলে। কৌশল্যার ছেলে রাম, কৈকেয়ীর ছেলে ভরত, সুমিত্রার ছেলে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। চারটি ছেলে যেমন রূপবান তেমনি গুণবান। সবাই তাদের ভালবাসে। পরম আদরে তারা মানুষ হয়। রাজা-রাণীদের তারা নয়নের মণি। কেউ একদণ্ড তাদেরকে চোখের আড়াল করে না।



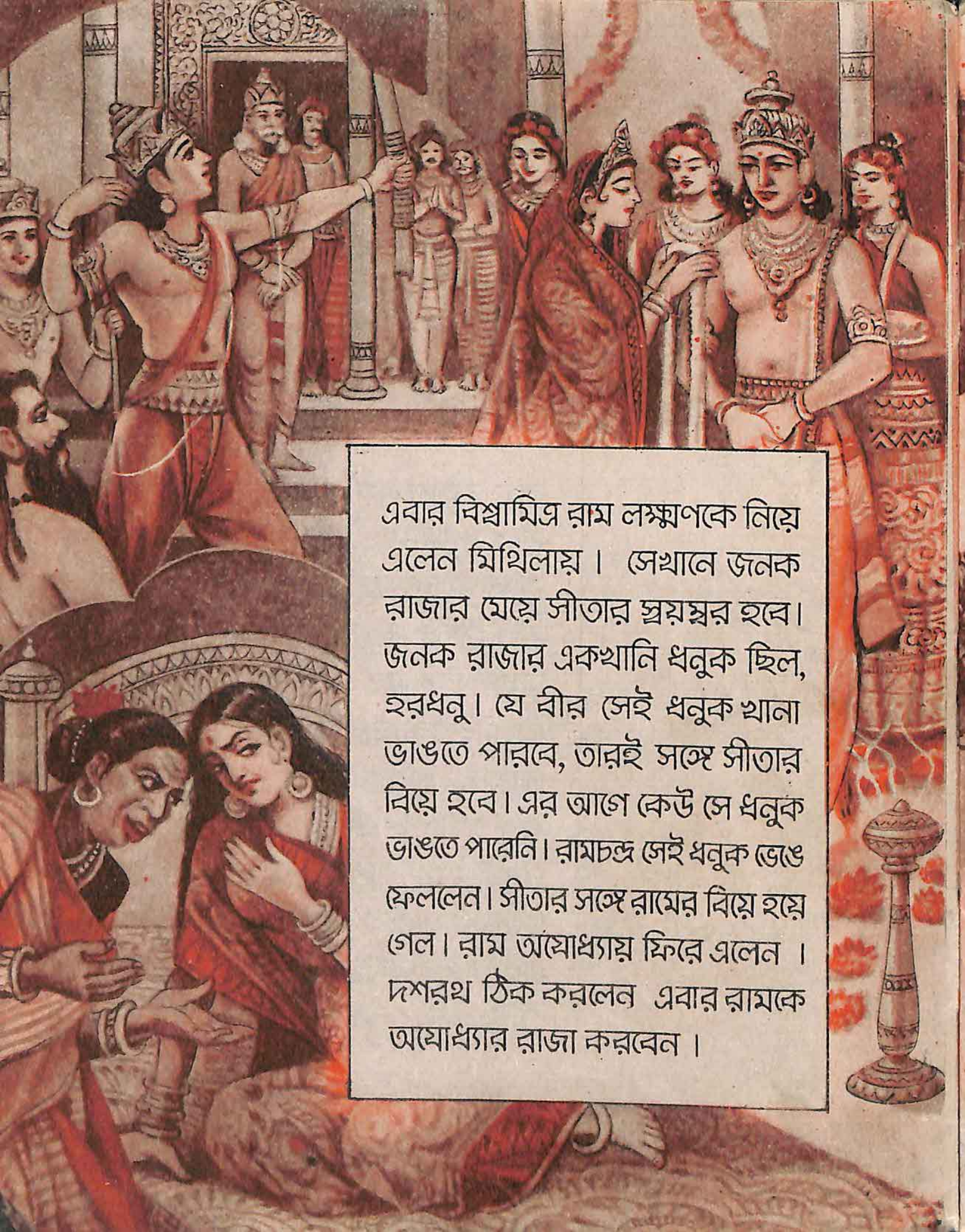
পাঁচ বছর বয়স হল।
চার ভাইয়ের হাতেখড়ি হল।
বশিষ্ঠ মুনির কাছে লেখাপড়া সুরু
হল। সব শাস্ত্র তারা পড়লেন।
শিখলেন মল্লবিদ্যা ও অস্ত্রবিদ্যা।
সর্ব বিদ্যায় সেরা হলেন বড়
ভাই রামচন্দ্র।
লোকের মুখে মুখে খ্যাতি রটে গেল
রূপে গুণে এমন ছেলে হয় না।
রাজা দশরথ ছেলেদের সুনামে
বড়ই আনন্দিত হলেন।
সুখেই তাঁর দিন কাটতে লাগল।



এমন সময় একদিন বিশ্বামিত্র মুনি এলেন রাজার সভায়, বললেন — আমরা যজ্ঞ করছি, রাক্ষসেরা এসে যজ্ঞ নষ্ট করছে। রাম লক্ষ্মণ চলুক রাক্ষস মারতে। মুনি বড় রাগী, তাঁর শাপের ভয়ে দশরথ রাম ও লক্ষ্মণকে দিলেন মুনির সঙ্গে। চলতে চলতে তাঁরা এলেন এক বনে। সেখানে থাকত তাড়কা নামে এক রাক্ষসী। সে দু'ভাইকে দেখেই তেড়ে এল। দু'ভাইকে রাক্ষসী তো চায় তখনই গিলে খেতে।



রাম লক্ষ্মণ ভয় পেলেন না। ধনুকে তীর জুড়লেন। লড়াই বেধে গেল। রাক্ষসী সহজে হার মানতে চায় না। শেষে বজ্রবাণ মেরে রামচন্দ্র তাড়কাকে বধ করলেন। এবার বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে এলেন আশ্রমে। সেখানে মুনিরা বিনা বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করলেন। রাম লক্ষ্মণ ধনুর্বাণ হাতে নিয়ে যজ্ঞভূমি পাহারা দিলেন। যজ্ঞের ধোঁয়া দেখে রাক্ষসেরা উৎপাত করতে এল। কিন্তু রামের মার খেয়ে সবাই পালাল।



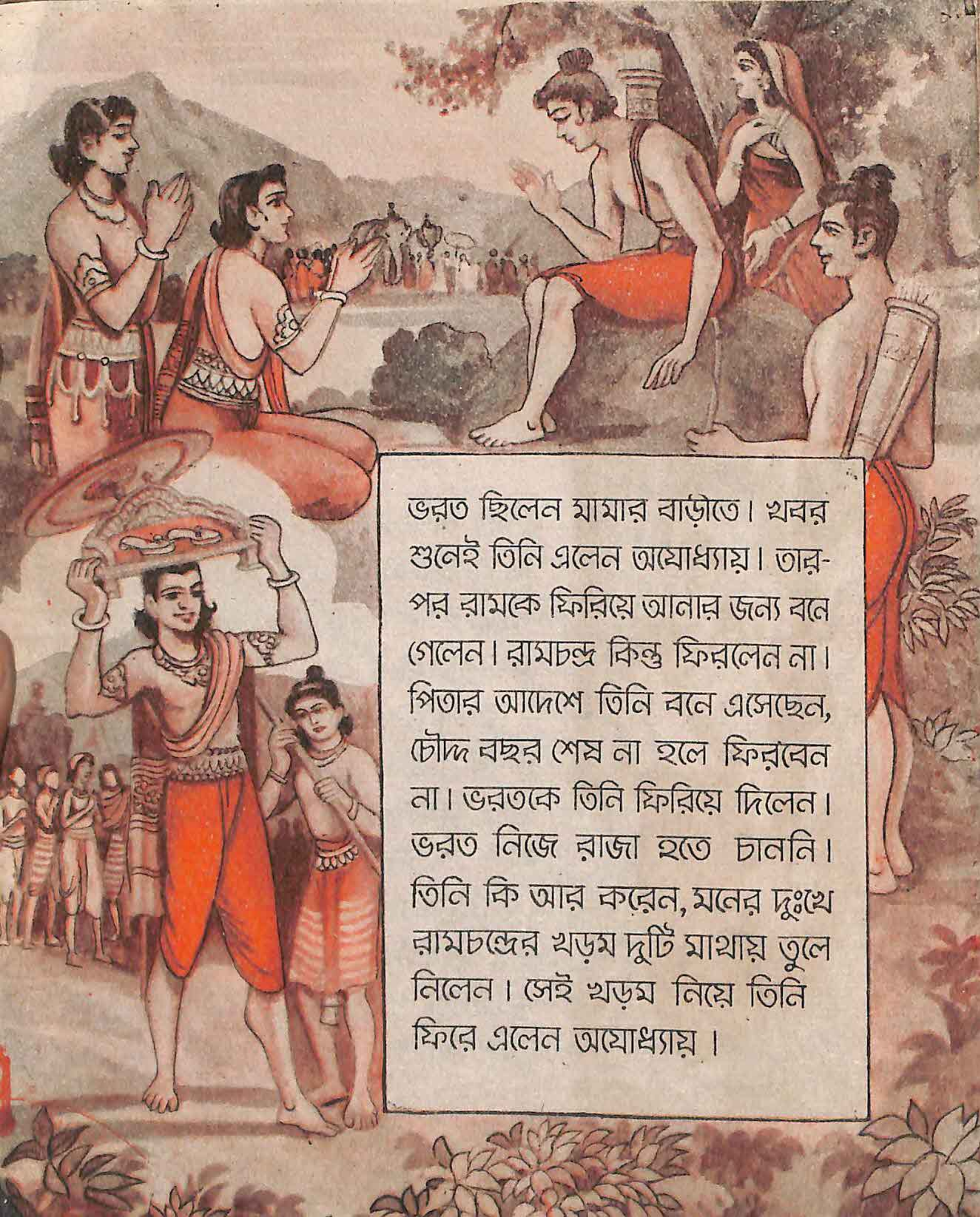
এবার বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে নিয়ে এলেন মিথিলায়। সেখানে জনক রাজার মেয়ে সীতার স্বয়ম্বর হবে। জনক রাজার একখানি ধনুক ছিল, হরধনু। যে বীর সেই ধনুক খানা ভাঙতে পারবে, তারই সঙ্গে সীতার বিয়ে হবে। এর আগে কেউ সে ধনুক ভাঙতে পারেনি। রামচন্দ্র সেই ধনুক ভেঙে ফেললেন। সীতার সঙ্গে রামের বিয়ে হয়ে গেল। রাম অযোধ্যায় ফিরে এলেন। দশরথ ঠিক করলেন এবার রামকে অযোধ্যার রাজা করবেন।



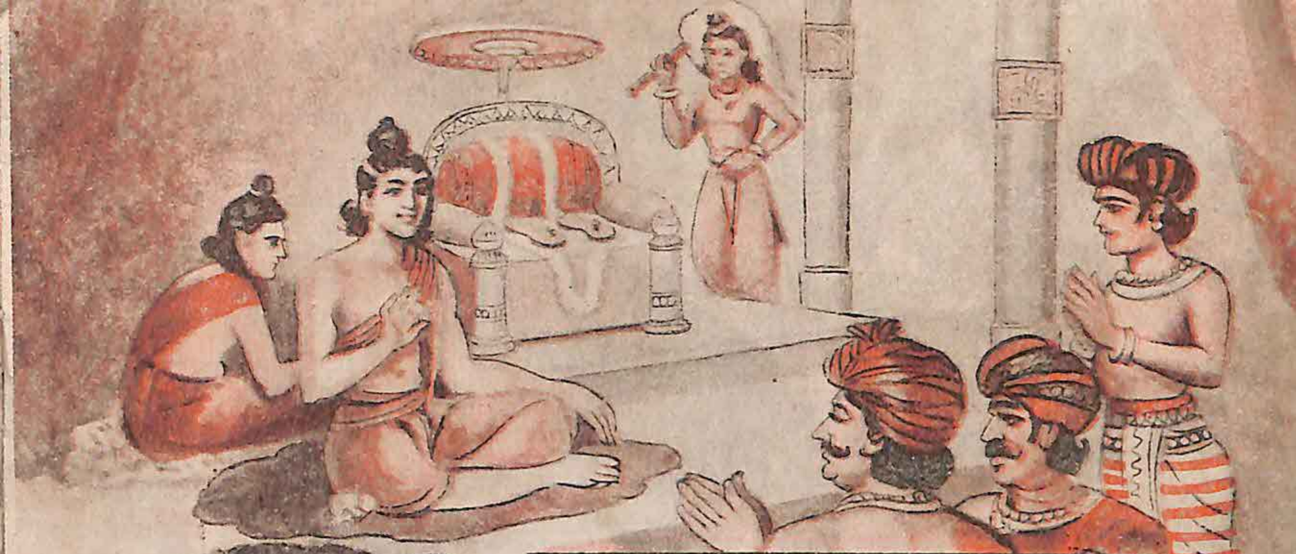
কিন্তু রাণী কৈকেয়ী বিমুখ হলেন, তিনি চাইলেন—তাঁর ছেলে ভরত রাজা হোক। আর রামচন্দ্র চৌদ্দ বছরের জন্য বনে চলে যাক।

রাজা দশরথকে শেষ অবধি কৈকেয়ীর কথাই মানতে হল। তিনি রামকে বনবাসে পাঠালেন। সঙ্গে গেলেন লক্ষ্মণ ও সীতা।

এদিকে দশরথের মনে বড়ই কষ্ট হল, তিনি আর সে শোক সামলাতে পারলেন না। মনের দুঃখে তিনি মারা গেলেন।



ভরত ছিলেন মামার বাড়ীতে। খবর শুনেই তিনি এলেন অযোধ্যায়। তার-পর রামকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনে গেলেন। রামচন্দ্র কিন্তু ফিরলেন না। পিতার আদেশে তিনি বনে এসেছেন, চৌদ্দ বছর শেষ না হলে ফিরবেন না। ভরতকে তিনি ফিরিয়ে দিলেন। ভরত নিজে রাজা হতে চাননি। তিনি কি আর করেন, মনের দুঃখে রামচন্দ্রের খড়ম দুটি মাথায় তুলে নিলেন। সেই খড়ম নিয়ে তিনি ফিরে এলেন অযোধ্যায়।



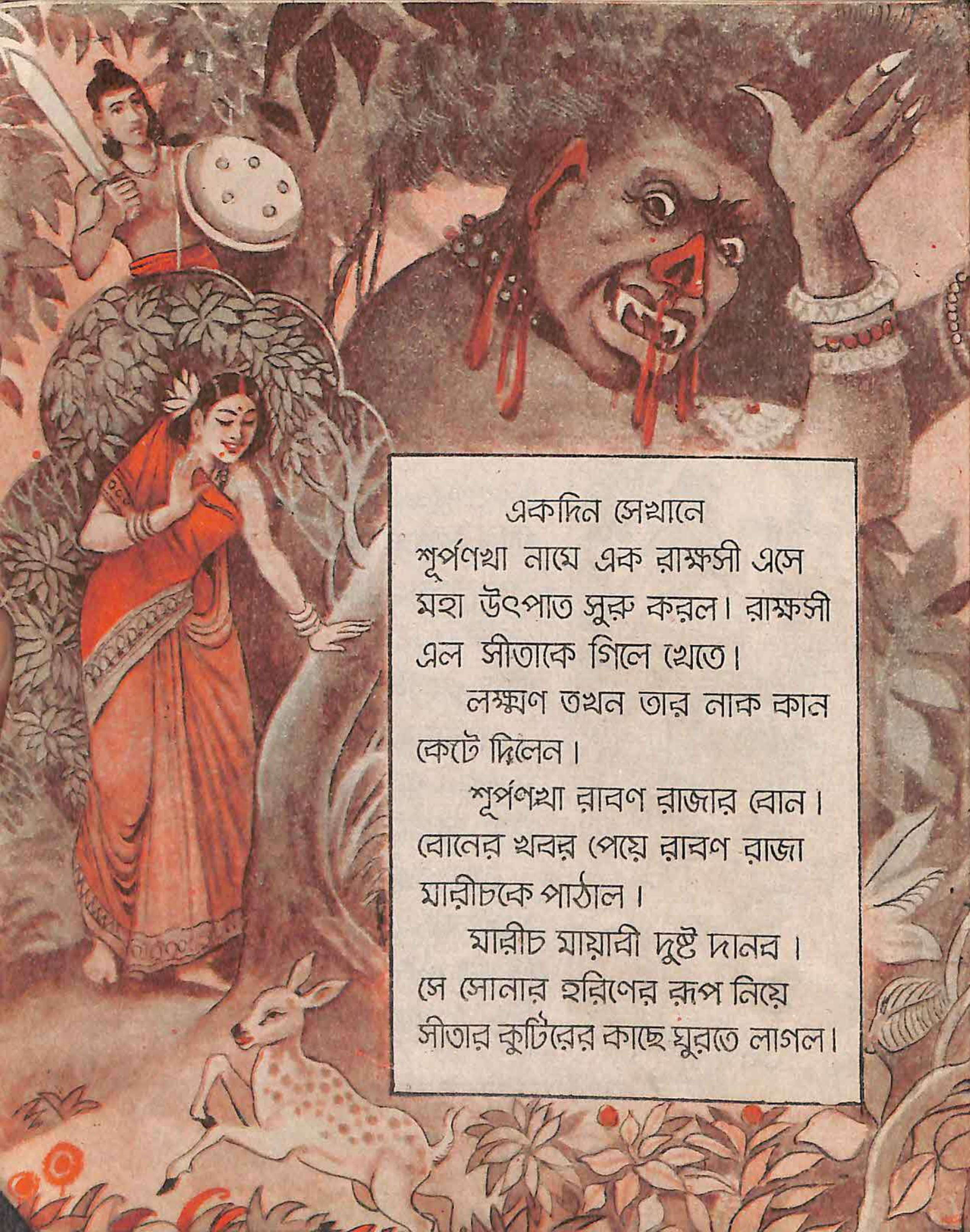
সিংহাসনে সেই খড়মজোড়া রেখেই তিনি রামের নামে রাজ্য চালাতে লাগলেন। রামচন্দ্র বনেই রয়ে গেলেন। নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে তিনি এলেন গোদাবরী তীরে।

গোদাবরী নদীর তীরে ছিল পঞ্চবটী বন। অতি মনোরম বন। রাম সেখানে কুটির বাঁধলেন।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা তিনজনে সেখানেই থাকেন। বড় আনন্দে তাঁদের দিন কাটে।

কিন্তু সে আনন্দ বেশীদিন সইল না।



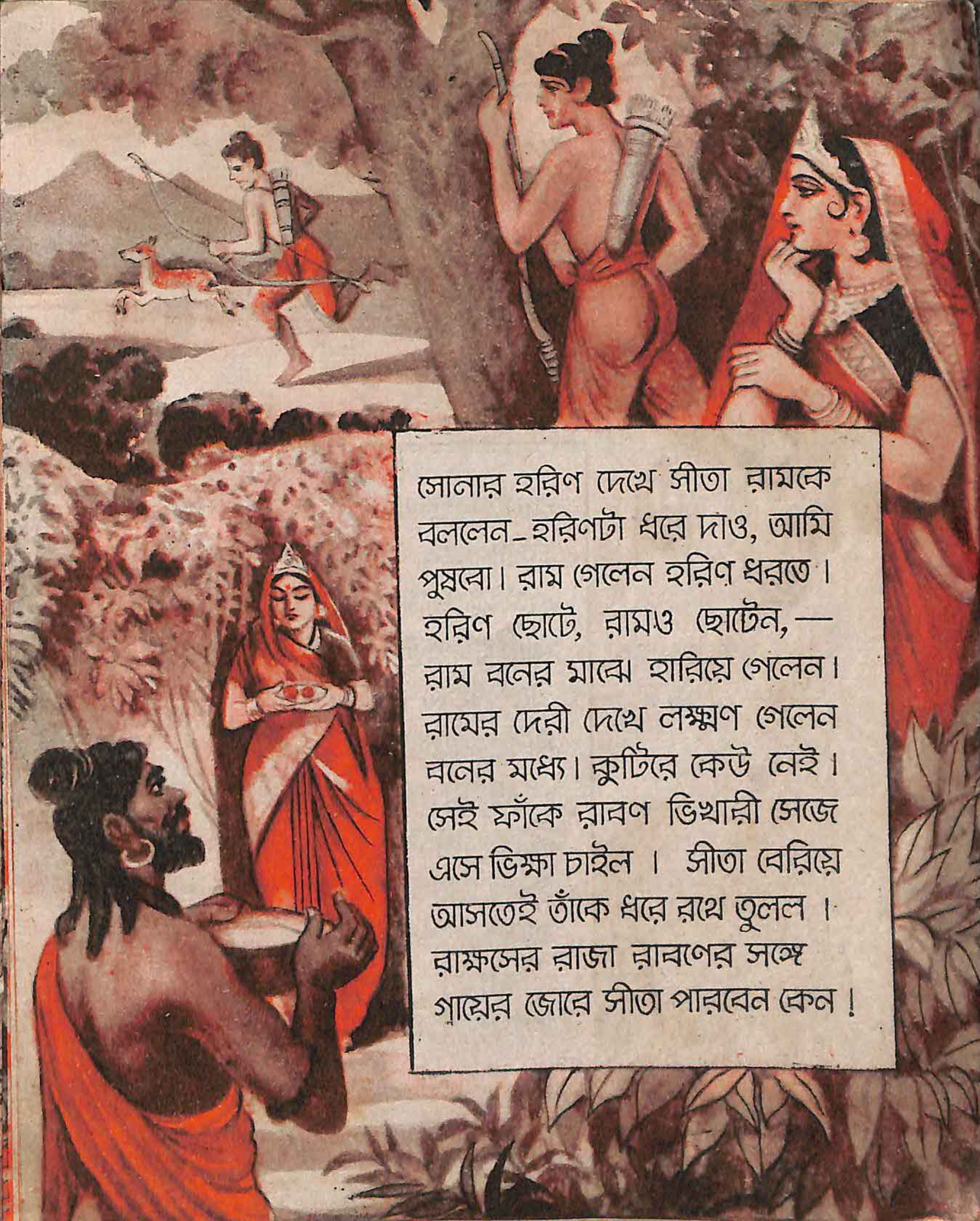


একদিন সেখানে শূর্পণখা নামে এক রাক্ষসী এসে মহা উৎপাত সুরু করল। রাক্ষসী এল সীতাকে গিলে খেতে।

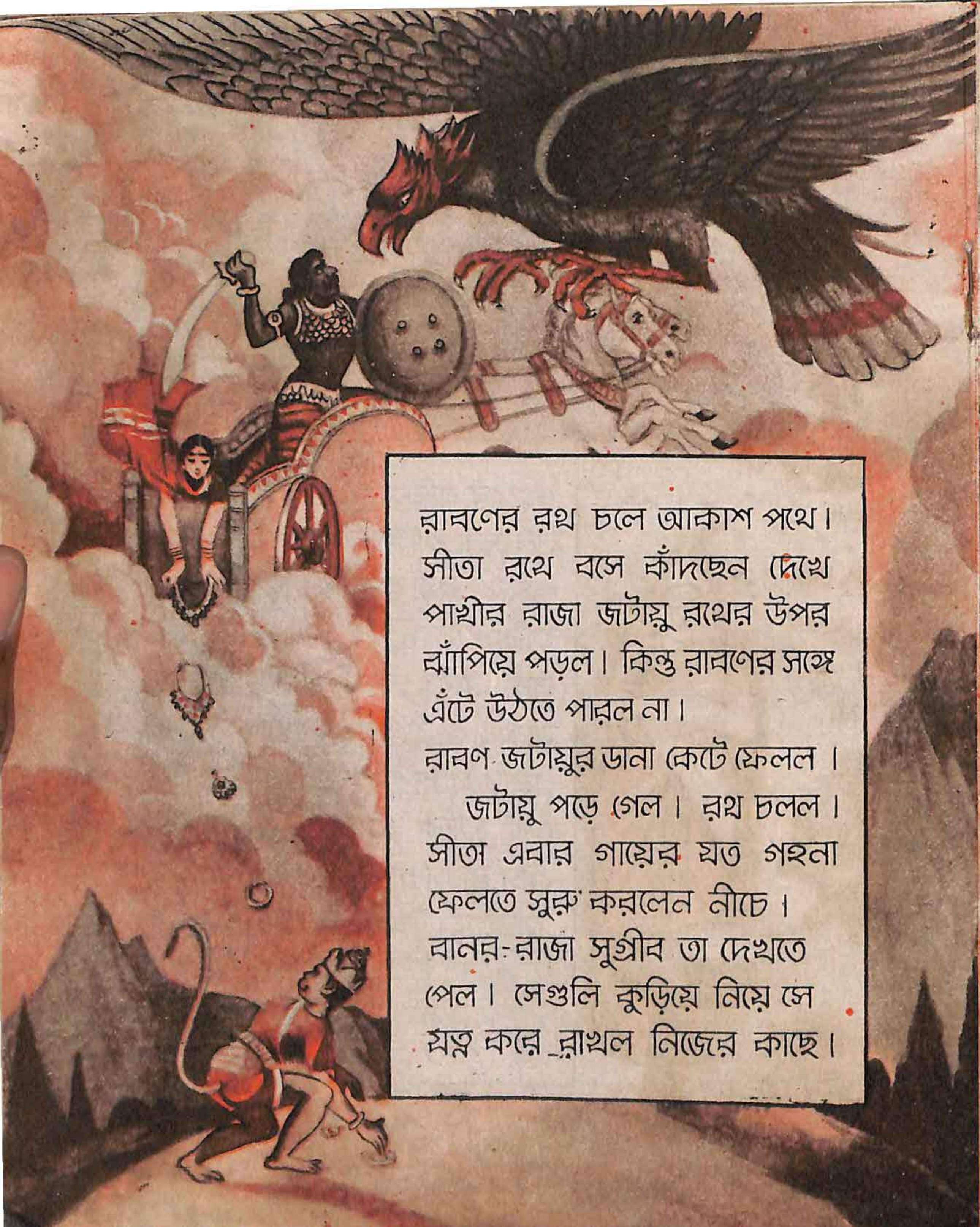
লক্ষ্মণ তখন তার নাক কান কেটে দিলেন।

শূর্পণখা রাবণ রাজার বোন। বোনের খবর পেয়ে রাবণ রাজা মারীচকে পাঠাল।

মারীচ মায়াবী দুষ্ট দানব। সে সোনার হরিণের রূপ নিয়ে সীতার কুটিরের কাছে ঘুরতে লাগল।



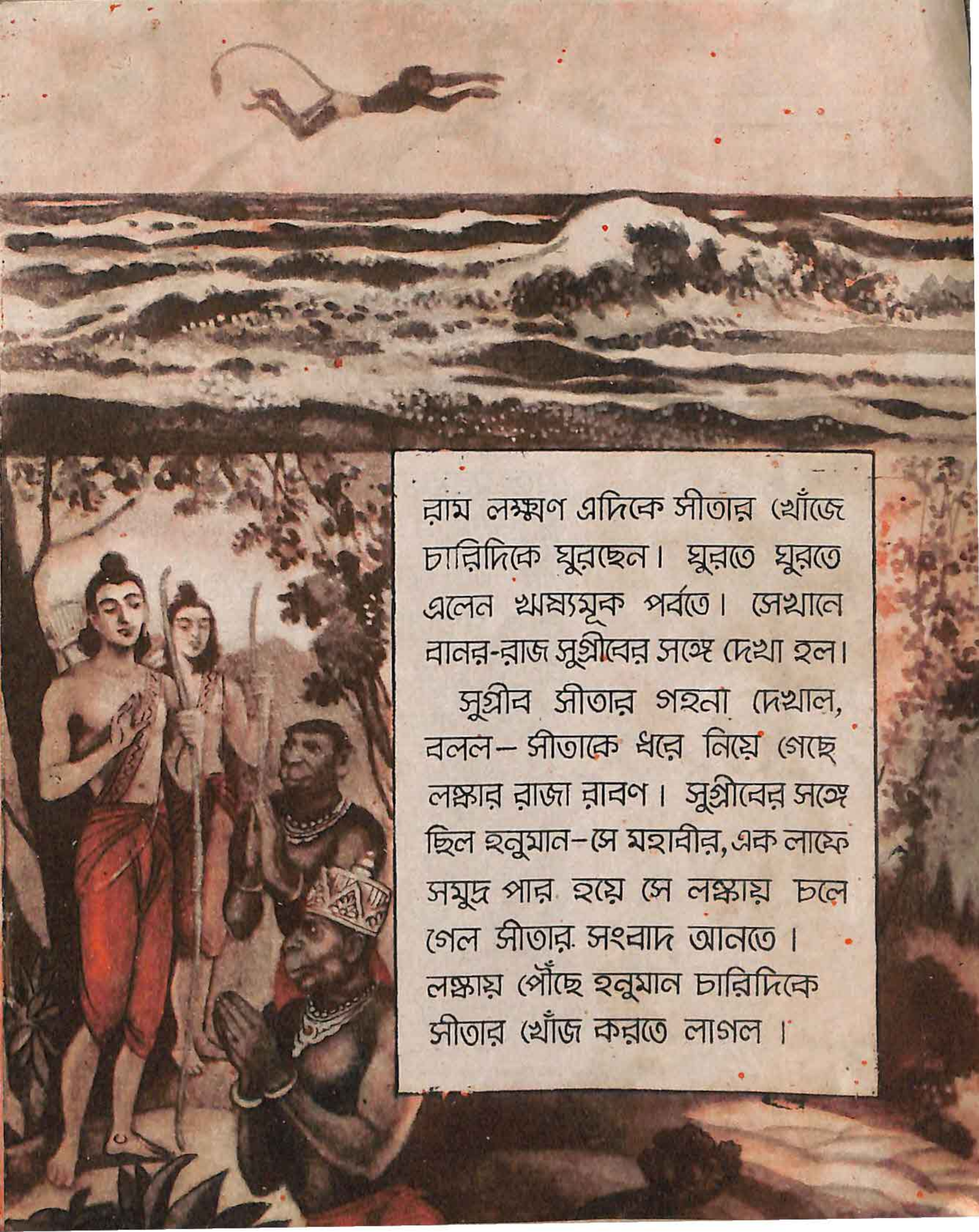
সোনার হরিণ দেখে সীতা রামকে বললেন– হরিণটা ধরে দাও, আমি পুষবো। রাম গেলেন হরিণ ধরতে। হরিণ ছোটে, রামও ছোটেন,— রাম বনের মাঝে হারিয়ে গেলেন। রামের দেরী দেখে লক্ষ্মণ গেলেন বনের মধ্যে। কুটিরে কেউ নেই। সেই ফাঁকে রাবণ ভিখারী সেজে এসে ভিক্ষা চাইল । সীতা বেরিয়ে আসতেই তাঁকে ধরে রথে তুলল । রাক্ষসের রাজা রাবণের সঙ্গে গায়ের জোরে সীতা পারবেন কেন !



রাবণের রথ চলে আকাশ পথে। সীতা রথে বসে কাঁদছেন দেখে পাখীর রাজা জটায়ু রথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু রাবণের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না।

রাবণ জটায়ুর ডানা কেটে ফেলল।

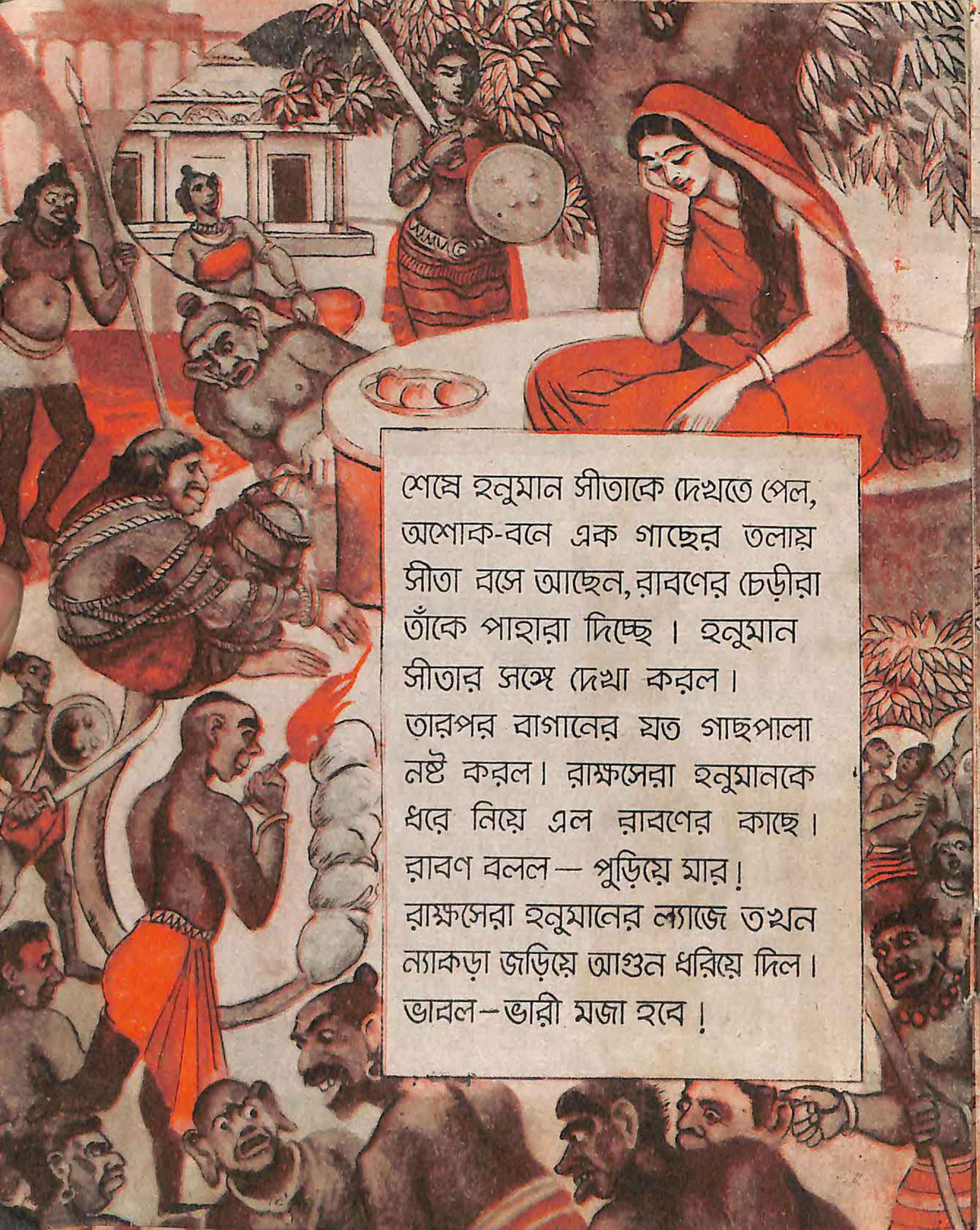
জটায়ু পড়ে গেল। রথ চলল। সীতা এবার গায়ের যত গহনা ফেলতে সুরু করলেন নীচে। বানর-রাজা সুগ্রীব তা দেখতে পেল। সেগুলি কুড়িয়ে নিয়ে সে যত্ন করে রাখল নিজের কাছে।



রাম লক্ষ্মণ এদিকে সীতার খোঁজে চারিদিকে ঘুরছেন। ঘুরতে ঘুরতে এলেন ঋষ্যমূক পর্বতে। সেখানে বানর-রাজ সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা হল।

সুগ্রীব সীতার গহনা দেখাল, বলল— সীতাকে ধরে নিয়ে গেছে লঙ্কার রাজা রাবণ। সুগ্রীবের সঙ্গে ছিল হনুমান—সে মহাবীর, এক লাফে সমুদ্র পার হয়ে সে লঙ্কায় চলে গেল সীতার সংবাদ আনতে।

লঙ্কায় পৌঁছে হনুমান চারিদিকে সীতার খোঁজ করতে লাগল।

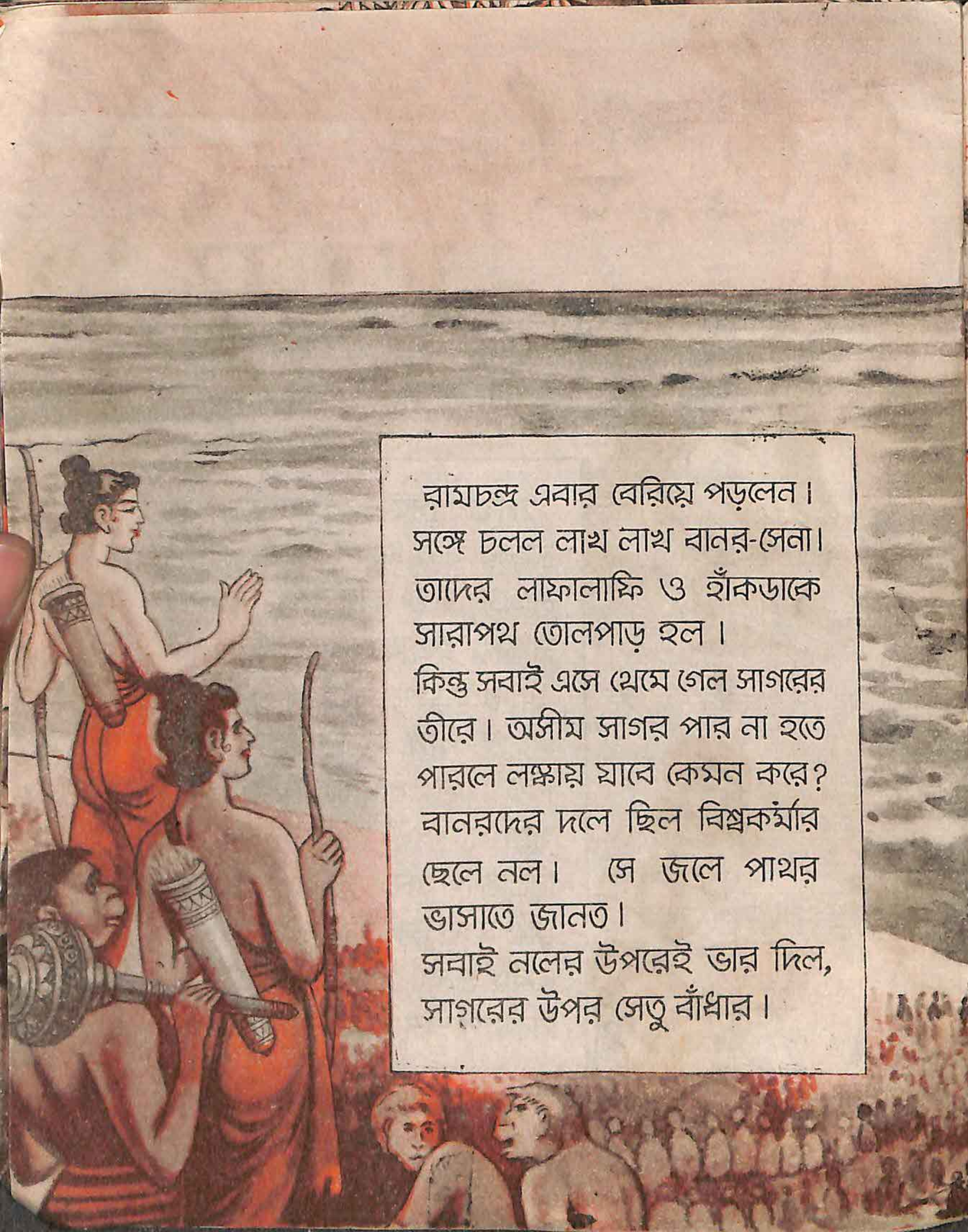


শেষে হনুমান সীতাকে দেখতে পেল, অশোক-বনে এক গাছের তলায় সীতা বসে আছেন, রাবণের চেড়ীরা তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। হনুমান সীতার সঙ্গে দেখা করল।
তারপর বাগানের যত গাছপালা নষ্ট করল। রাক্ষসেরা হনুমানকে ধরে নিয়ে এল রাবণের কাছে।
রাবণ বলল— পুড়িয়ে মার!
রাক্ষসেরা হনুমানের ল্যাজে তখন ন্যাকড়া জড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দিল।
ভাবল—ভারী মজা হবে!



হনুমান সেই জ্বলন্ত ল্যাজ নিয়ে লঙ্কার ঘরে ঘরে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল। বাড়ী বাড়ী আগুন ধরে গেল, লঙ্কায় হাহাকার পড়ে গেল।

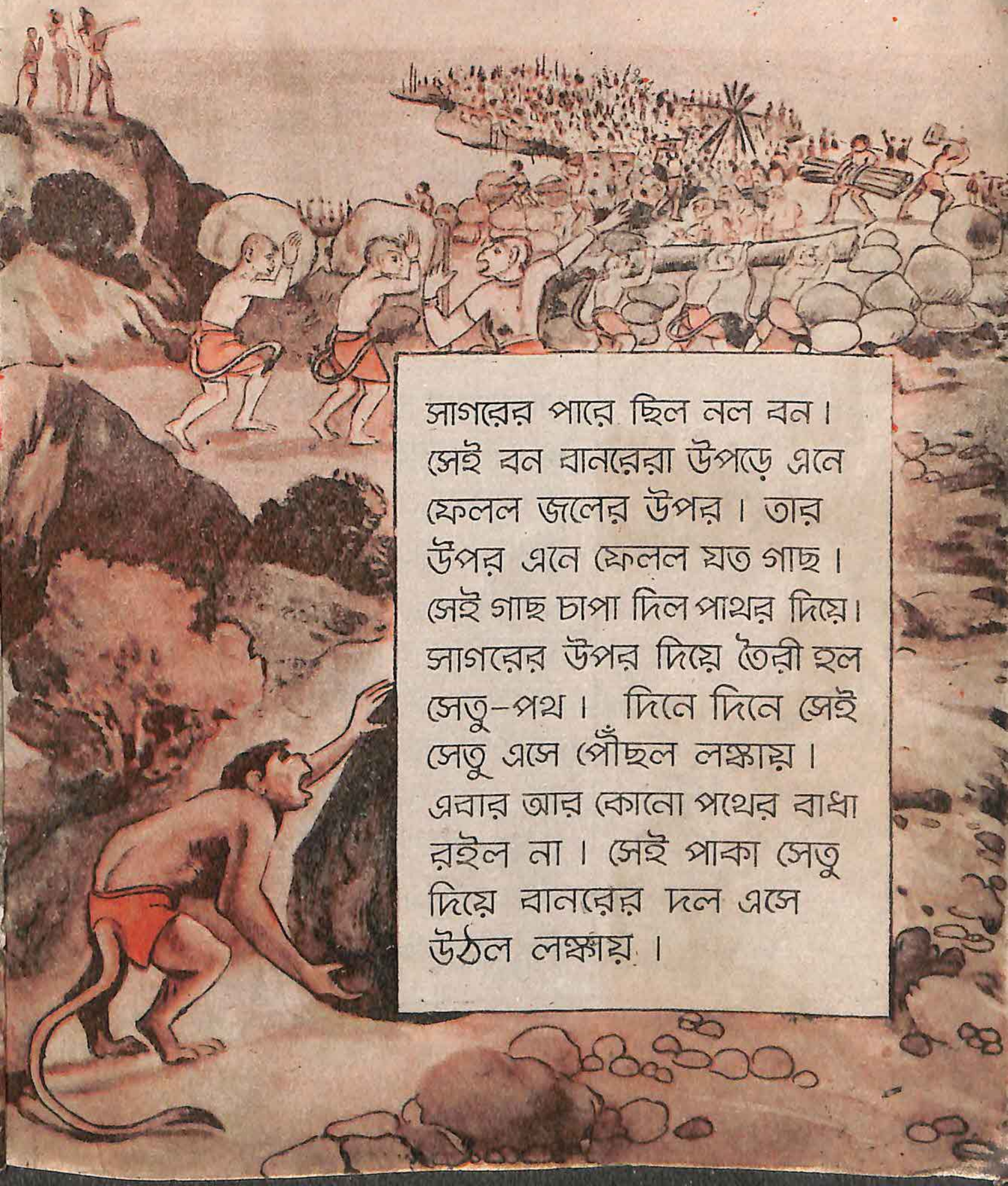
এবার হনুমান আবার এক লাফে সাগর পার হয়ে রামের কাছে ফিরে এল। রাম সীতার খবর পেয়ে খুশি হলেন। রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ। সে বলেছিল—সীতাকে চুরি করে আনা ভাল হয়নি। রাবণ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বিভীষণ এল রামচন্দ্রের কাছে।



রামচন্দ্র এবার বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে চলল লাখ লাখ বানর-সেনা। তাদের লাফালাফি ও হাঁকডাকে সারাপথ তোলপাড় হল।

কিন্তু সবাই এসে থেমে গেল সাগরের তীরে। অসীম সাগর পার না হতে পারলে লঙ্কায় যাবে কেমন করে? বানরদের দলে ছিল বিশ্বকর্মার ছেলে নল। সে জলে পাথর ভাসাতে জানত।

সবাই নলের উপরেই ভার দিল, সাগরের উপর সেতু বাঁধার।

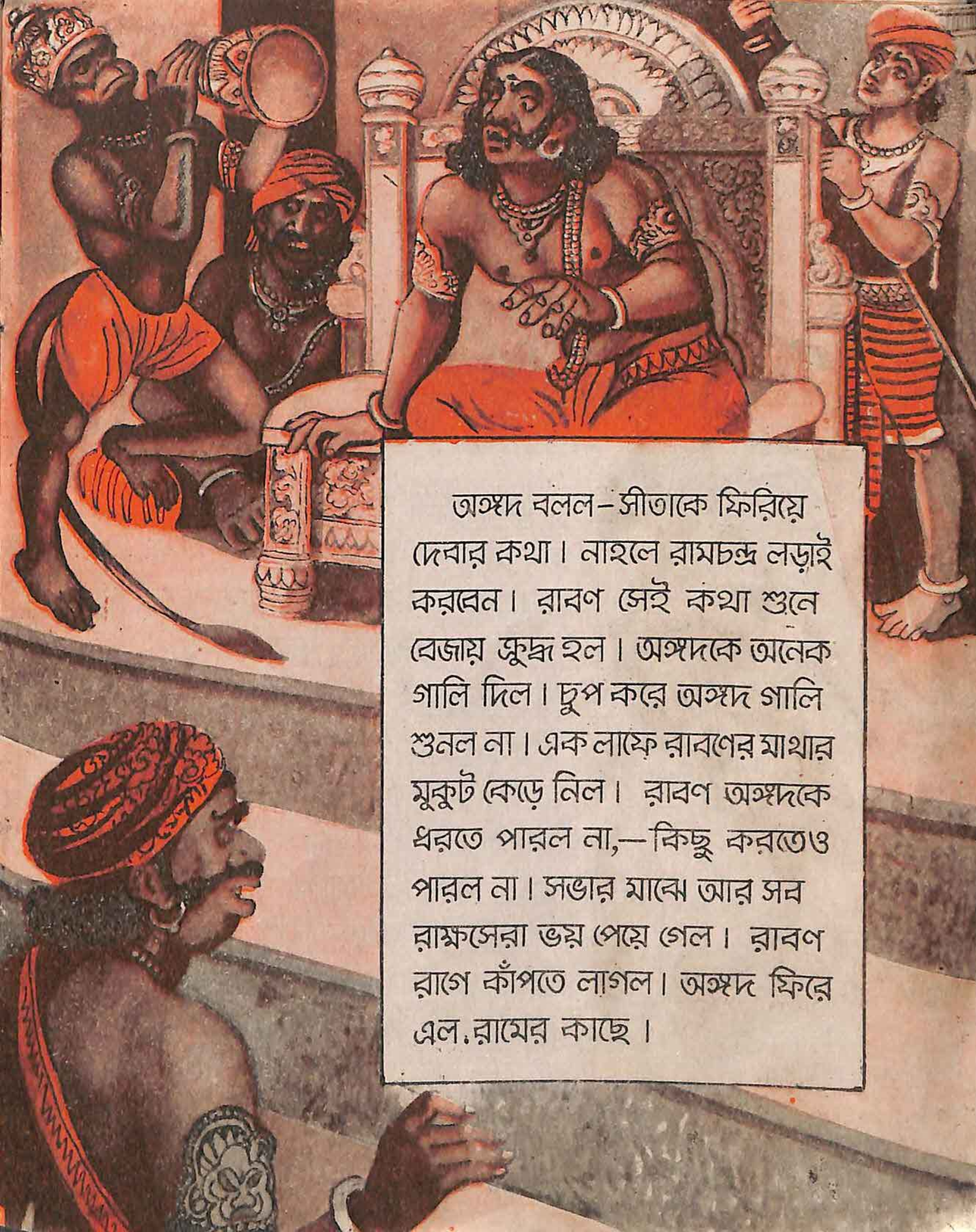


সাগরের পারে ছিল নল বন। সেই বন বানরেরা উপড়ে এনে ফেলল জলের উপর। তার উপর এনে ফেলল যত গাছ। সেই গাছ চাপা দিল পাথর দিয়ে। সাগরের উপর দিয়ে তৈরী হল সেতু-পথ। দিনে দিনে সেই সেতু এসে পৌঁছল লঙ্কায়। এবার আর কোনো পথের বাধা রইল না। সেই পাকা সেতু দিয়ে বানরের দল এসে উঠল লঙ্কায়।



রাম লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ সবাই এবার এলেন লঙ্কাপুরীতে, আর সঙ্গে যত বানরের দল।

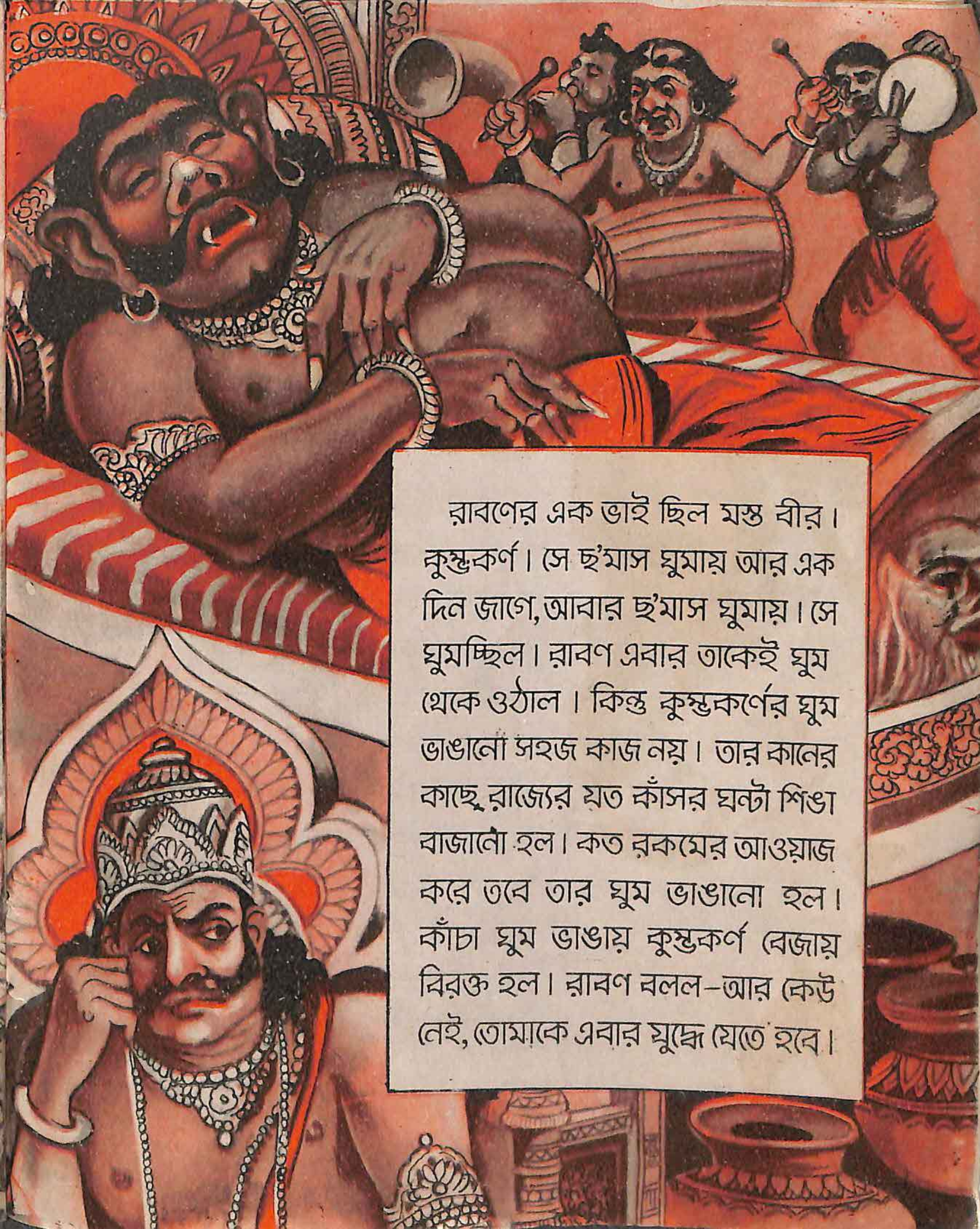
নগরের বাইরে তাদের ছাউনি পড়ল। সুরু হল হৈ চৈ হল্লা। রামচন্দ্র এবার দূত পাঠালেন রাবণের কাছে। সুগ্রীবের ভাইপো অঙ্গদকে বলে দিলেন কি বলতে হবে। সব শুনে নিয়ে, শিখে নিয়ে অঙ্গদ গেল রাবণের রাজসভায়। দিব্যি ভালমানুষ সেজে অঙ্গদ রাবণের রাজসভায় গিয়ে বসল।



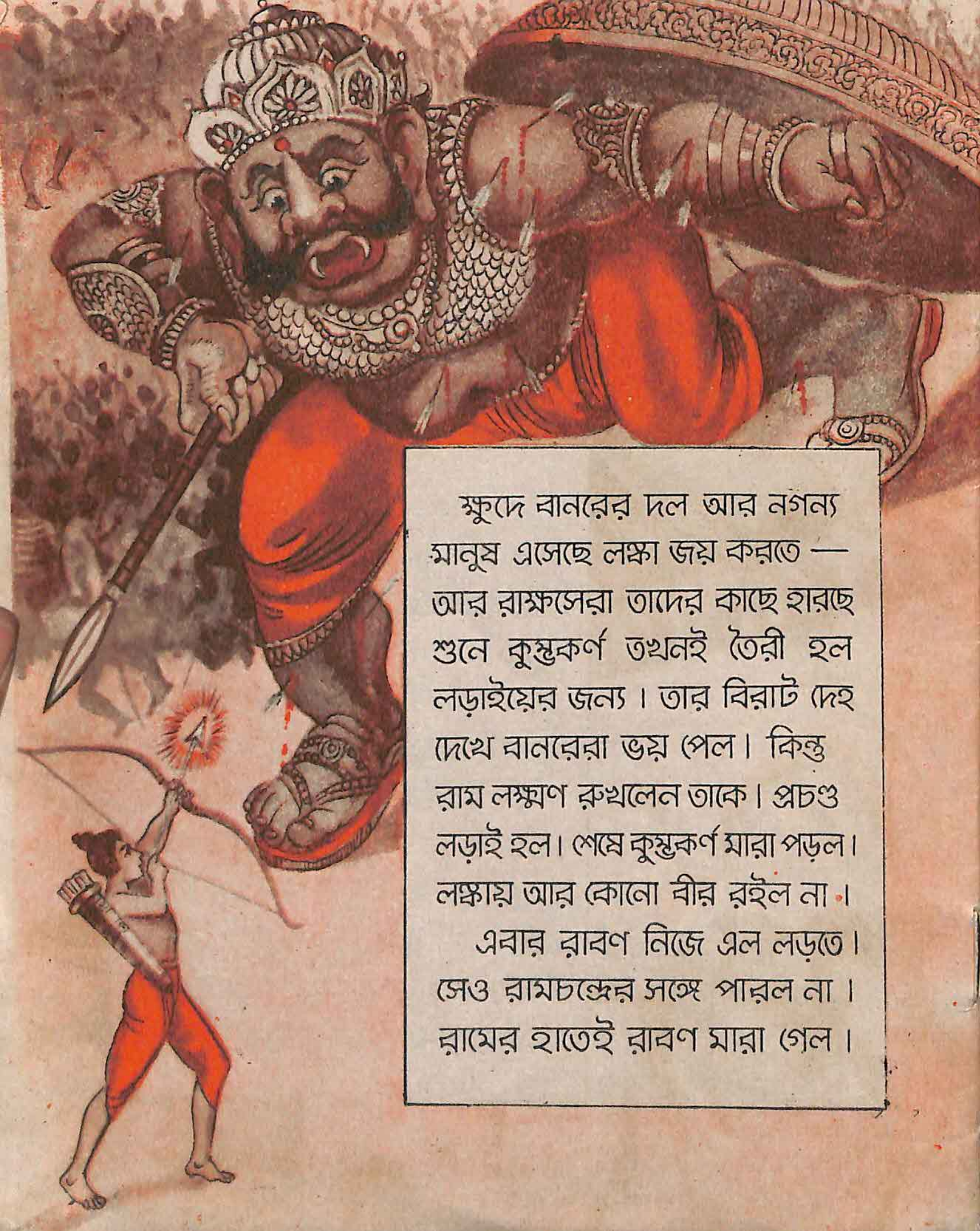
অঙ্গদ বলল– সীতাকে ফিরিয়ে দেবার কথা। নাহলে রামচন্দ্র লড়াই করবেন। রাবণ সেই কথা শুনে বেজায় ক্রুদ্ধ হল। অঙ্গদকে অনেক গালি দিল। চুপ করে অঙ্গদ গালি শুনল না। এক লাফে রাবণের মাথার মুকুট কেড়ে নিল। রাবণ অঙ্গদকে ধরতে পারল না,— কিছু করতেও পারল না। সভার মাঝে আর সব রাক্ষসেরা ভয় পেয়ে গেল। রাবণ রাগে কাঁপতে লাগল। অঙ্গদ ফিরে এল.রামের কাছে।



এবার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। একদিকে রাক্ষস, আর এক দিকে বানরের দল। রাক্ষসেরা নানা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে বানরদের সঙ্গে লড়ছে,—কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছে না। বানরেরা গাছ পাথর দিয়েই রাক্ষস-দের মারছে। আর এক দিকে রাবণের যত সেনাপতিদের সঙ্গে লড়ছেন রাম আর লক্ষ্মণ। কোনো রাক্ষস সেনা-পতিই রেহাই পাচ্ছে না। যে একবার লড়তে আসছে সে আর ফিরে যাচ্ছে না। শেষ অবধি লঙ্কা বীরশূন্য হয়ে গেল।



রাবণের এক ভাই ছিল মস্ত বীর। কুম্ভকর্ণ। সে ছ'মাস ঘুমায় আর এক দিন জাগে, আবার ছ'মাস ঘুমায়। সে ঘুমচ্ছিল। রাবণ এবার তাকেই ঘুম থেকে ওঠাল। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানো সহজ কাজ নয়। তার কানের কাছে রাজ্যের যত কাঁসর ঘন্টা শিঙা বাজানো হল। কত রকমের আওয়াজ করে তবে তার ঘুম ভাঙানো হল। কাঁচা ঘুম ভাঙায় কুম্ভকর্ণ বেজায় বিরক্ত হল। রাবণ বলল—আর কেউ নেই, তোমাকে এবার যুদ্ধে যেতে হবে।



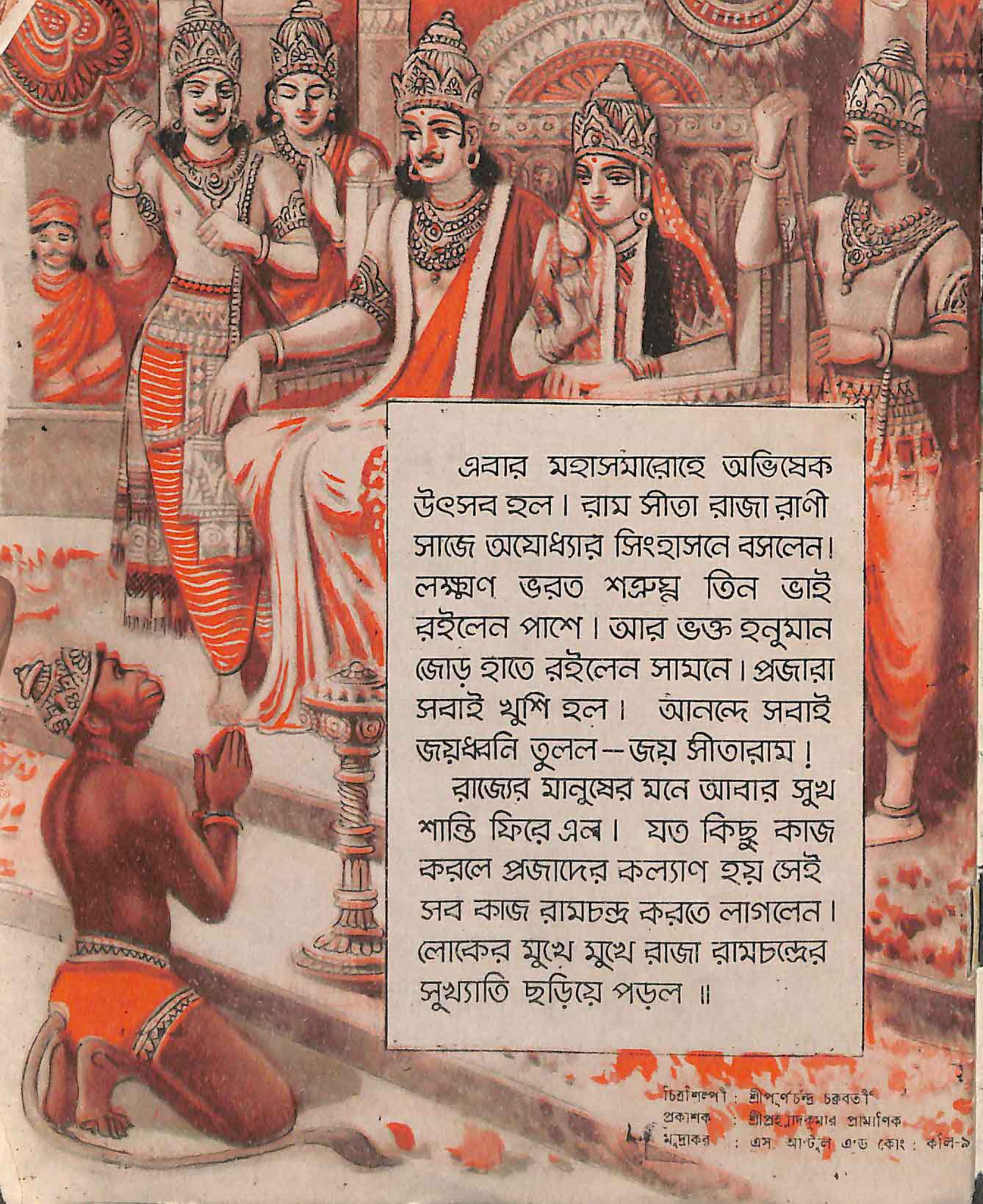
ক্ষুদে বানরের দল আর নগন্য মানুষ এসেছে লঙ্কা জয় করতে — আর রাক্ষসেরা তাদের কাছে হারছে শুনে কুম্ভকর্ণ তখনই তৈরী হল লড়াইয়ের জন্য। তার বিরাট দেহ দেখে বানরেরা ভয় পেল। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ রুখলেন তাকে। প্রচণ্ড লড়াই হল। শেষে কুম্ভকর্ণ মারা পড়ল। লঙ্কায় আর কোনো বীর রইল না।

এবার রাবণ নিজে এল লড়তে। সেও রামচন্দ্রের সঙ্গে পারল না। রামের হাতেই রাবণ মারা গেল।



রাবণ মারা গেল। রাম জিতলেন। লঙ্কা জয় হল। রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করলেন। এদিকে বনবাসের কাল ও তখন শেষ হয়েছে। চৌদ্দ বছর কেটে গেছে। বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করে রামচন্দ্র দেশে ফেরার জন্য তৈরী হলেন। রাবণের পুষ্পক রথে চড়ে রাম লক্ষ্মণ সীতা আকাশ পথে উড়লেন। সমুদ্র বন জংগল পাহাড় পর্বত পার হয়ে অতি শীঘ্র তাঁরা অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

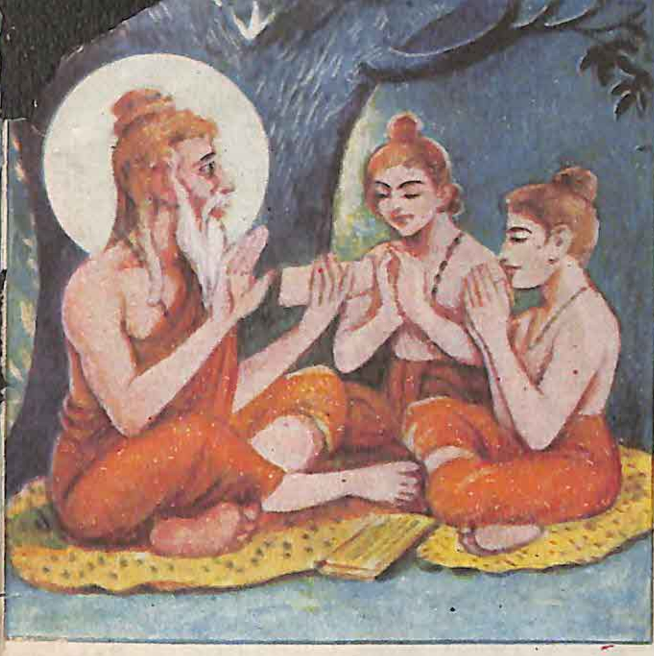
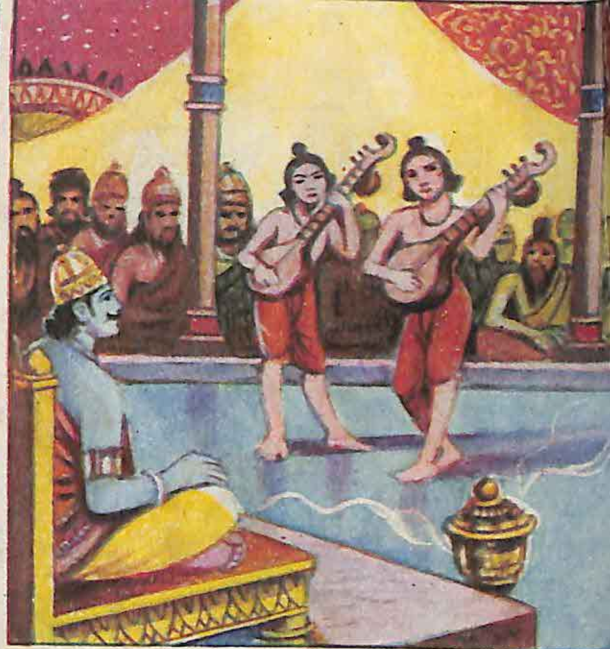
অযোধ্যায় আনন্দের সাড়া পড়ে গেল।



এবার মহাসমারোহে অভিষেক উৎসব হল। রাম সীতা রাজা রাণী সাজে অযোধ্যার সিংহাসনে বসলেন। লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন তিন ভাই রইলেন পাশে। আর ভক্ত হনুমান জোড় হাতে রইলেন সামনে। প্রজারা সবাই খুশি হল। আনন্দে সবাই জয়ধ্বনি তুলল—জয় সীতারাম!

রাজ্যের মানুষের মনে আবার সুখ শান্তি ফিরে এল। যত কিছু কাজ করলে প্রজাদের কল্যাণ হয় সেই সব কাজ রামচন্দ্র করতে লাগলেন। লোকের মুখে মুখে রাজা রামচন্দ্রের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল ॥

চিত্রশিল্পী : শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
প্রকাশক : শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
মুদ্রাকর : এস. আর্টুন এণ্ড কোং : কলি-৯

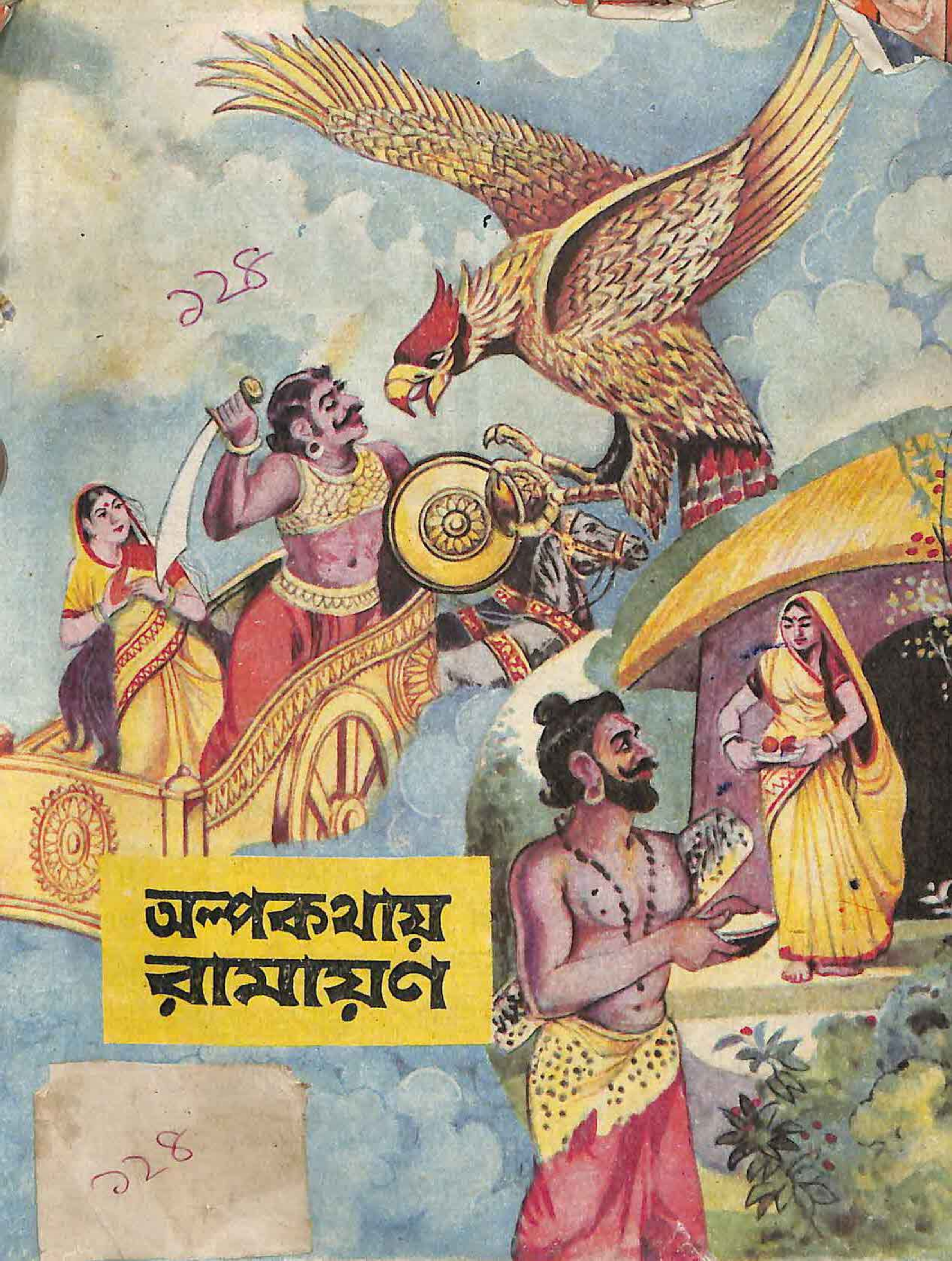



সীতা রাণী হলেন কিন্তু প্রজারা বলল_'রাক্ষসের বাড়ীতে ছিলেন এমন রাণী আমরা চাই না।' রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠালেন।

তপোবনে বাল্মীকির আশ্রমে সীতা রইলেন, সেখানে তাঁর যমজ ছেলে হলো, লব-কুশ। বাল্মীকি তাদের লেখাপড়া শেখালেন আর শেখালেন রামায়ণ গান।

রাম রাজসূয় যজ্ঞ করলেন। সেই সভায় গিয়ে লব-কুশ রামায়ণ গান করলেন। পরিচয় প্রকাশ হলো, রামচন্দ্র তখনই সীতাকে আনতে লোক পাঠালেন। সীতা রাজসভায় এলেন, প্রজারা বলল_'রাণী হতে হলে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে।' সীতা তখন বললেন_'হে মা ধরিত্রী, আমাকে কোলে টেনে নাও।' তখনই মাটি ফেটে গেলো, সীতা সেই ফাটলে প্রবেশ করলেন, ফাটল বুজে গেল। লব-কুশ মা মা বলে কেঁদে উঠল, সবাই হায় হায় করতে লাগল।

"দুঃখিনী সীতার হলো দুঃখের শেষ।
রামায়ণ কাহিনীর এই অবশেষ ॥"


অল্পকথায়
রামায়ণ